একক ৩৪ ❐ মুঘল দরবারে দল ও রাজনীতি

গঠন ঃ

৩৪.০ উদ্দেশ্য

৩৪.১ প্রস্তাবনা

৩৪.২ মুঘল সমাজব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শ্রেণীগুলির আলোচনা

৩৪.২.১ জমিদার শ্রেণী

৩৪.২.২ জায়গীরদার এবং অন্যান্য স্বত্বাধিকারী

৩৪.৩ অভিজাত শ্রেণীর বিন্যাস, গঠন এবং চরিত্র

৩৪.৪ অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল অবিজাত শ্রেণীর সামনে সঙ্কট

৩৪.৪.১ রাজনৈতিক সমস্যা

৩৪.৪.২ জায়গীরদারী ব্যবস্থার সঙ্কট

৩৪.৪.৩ অদূরদর্শী মুঘল অভিজাতদের আত্মক্ষয়ী সংগ্রাম

৩৪.৫ সারাংশ

৩৪.৬ অনুশীলনী

৩৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩৪.০ উদ্দেশ্য

তুর্ক-আফগান এবং মুঘল এই দুটি রাজনৈতিক শক্তিকে নিয়ে ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাস রচিত হয়েছে। একদা শৌর্যে, বীর্যে, পরাক্রমে অতুলনীয় মুঘলশক্তি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে তার জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলে। ফলে বিদেশী ইংরেজ শক্তির ভারতে ক্ষমতা দখলের পথ প্রশস্ত হয়।

এই একক পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন—

- অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল রাষ্ট্রশক্তির সামনে উদ্ভূত সমস্যা।
- উক্ত সমস্যা সমাধানে মুঘল রাষ্ট্রশক্তির ব্যর্থতা।
- সর্বনাশা আত্মকলহে মত্ত মুঘল অভিজাতবর্গ কিভাবে সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনে।

৩৪.১ প্রস্তাবনা

সুদীর্ঘকাল মুঘল শাসনে মুঘল অভিজাতবর্গ প্রায় একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। মুঘল

সাম্রাজ্যের গটন ও বিন্যাসে, প্রশাসনে, সমাজ ও অর্থনীতিতে সর্বত্র মুঘল অভিজাতবর্গের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অভিজাতবর্গের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনও শুরু হয়। সুতরাং অভিজাতবর্গের সমস্যা অনুধাবন করতে না পারলে মুঘল সাম্রাজ্যের সমস্যা ও সঙ্কট সর্বোপরি তার চূড়ান্ত অবক্ষয় সম্বন্ধে কোন ধারণা করা সম্ভব নয়। বাস্তবিকপক্ষে, সমস্ত মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব অভিজাতবর্গের সুষ্ঠু কাজকর্মের উপর নির্ভর করত। অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে অভিজাতবর্গ রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব রক্ষায় তাদের উপযুক্ত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। তারই ফলস্বরূপ দেখা দেয় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতী. ও তৃতীয় শতকে উত্তর ভারতে মারাঠাদের অগ্রগতি, নাদির শাহের আক্রমণ (১৭৩৯), উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগান সমস্যা। রাষ্ট্রীয় সঙ্কটের সময় দল ও গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে উঠে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করবার পরিবর্তে তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতার বশবর্তী হয়ে মুঘল অভিজাতবর্গ সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

নাদির শাহের ভারত আক্রমণের পর মুঘল অভিজাতবর্গ আর কোন স্বাধীন ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি। নাদির শাহের ভারত আক্রমণ থেকে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ অবধি (১৭৬১) সাম্রাজ্যকে বাঁচাবার নতুন কোন প্রশ্ন অভিজাতবর্গের সামনে উপস্থিত হয়নি। অভিজাতবর্গেরাই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনেন আবার সাম্রাজ্যের পতনের প্রক্রিয়া শুরু হ'লে তার চাপে পড়ে অভিজাতবর্গের পতন ত্বরান্বিত হয়। মুঘল শাসন ব্যবস্থার মত কেন্দ্রাতিগ শাসনব্যবস্থায় সম্রাটের ব্যক্তিগত সাফল্য ও ব্যর্থতার উপর অভিজাতবর্গের আনুগত্য অনেকাংশে নির্ভর করত। আওরঙ্গাদেজবের মৃত্যুর পর আর কোন মুঘল সম্রাট অভিজাতবর্গের অংশের উপর পূর্বের মতন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। সম্রাটের অবর্তমানে উজীররাও ব্যর্থ হন। এইভাবে ব্যক্তিগত ব্যর্থতা এবং সাম্রাজ্যের পতনের প্রক্রিয়া একে অপরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধির জন্যে নয় ; নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অভিজাতবর্গ নিজেদের সমস্ত শক্তিকে ব্যয় করেছিলেন। তাই সাম্রাজ্যের দুর্দিনে শক্ত হাতে হাল ধরতে পারনেনি ; উপরন্তু নিজেরাই তার পতনকে ত্বরান্বিত করেছিলেন।

৩৪.২ মুঘল শাসনব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শ্রেণীগুলি সম্বন্ধে আলোচনা

মুঘল সমাজব্যবস্থা কয়েকটি স্তরবিন্যাসে বিভক্ত ছিল। উপরতলায় ছিলেন শাসকশ্রেণী, যারা সংখ্যায় অল্প কিন্তু ক্ষমতায় অত্যন্ত শক্তিশালী, তলার দিকে ছিলেন কৃষককুল, কারিগর ও হস্তশিল্পী সম্প্রদায় এবং অন্যান্যরা। সমাজব্যবস্থা চূড়ান্ত অসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অভিজাতদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার পাশে জনগণের অধিকাংশ কায়ক্লেশে জীবনধারণ করতেন, প্রায় সব বিদেশী পর্যটক দরিদ্র জনতার বসনের স্বল্পতার কথা উল্লেখ করেছেন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ছাড়া অন্যান্য সময় খাদ্যের কষ্ট বোধহয় অত তীব্র ছিল না। কিন্তু এই দরিদ্র জনতার মধ্যে বিশেষ করে কৃষককুলে একধরনের বৈষম্য ছিল ; ভূমিহীন কৃষক সম্প্রদায়ের করুণ অবস্থার কথা দেশী ও বিদেশী সব লেখকেরাই বর্ণনা করেছেন। কাজ না থাকলে এরা রোজগারের আশায় শহরে গিয়ে ভিড় জমাতেন এবং খুবই সাধারণ মানের কাজ করে জীবন কাটাতেন। প্রজা বিদ্রোহের সময় এই সম্প্রদায়ের লোকদের

ব্যবহার করা হ'ত অথবা এরাও বোধহয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিতেন। উপযুক্ত তথ্যের অভাবে যদিও কোন নির্দিষ্ট মত দেওয়া কঠিন কিন্তু মুঘল কৃষিব্যবস্থার সঙ্কট এদের স্পর্শ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অভিজাতশ্রেণী এবং জমিদারদের নিয়ে মধ্যযুগের ভারতে শাসকশ্রেণী গঠিত ছিল। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই মুঘল শাসকশ্রেণী ছিল সুবিধাভোগী সম্প্রদায়। বিভিন্ন জাতির লোক নিয়ে অভিজাতশ্রেণী গঠিত হ'ত। মুঘলদের পিতৃভূমি তুরান এবং প্রতিবেশী তাজিকিস্তান, ইরান থেকে বহু অভিজাত মুঘল শাসকশ্রেণীকে স্পীত করেছিলেন। পরবর্তীকালে আফগান এবং ভারতীয় মুসলিমরা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে অভিজাত পদে উন্নীত হয়েছিলেন। আকবরের সময় থেকে হিন্দুরাও নিয়মিতভাবে অভিজাতদের দল বৃদ্ধি করতে থাকেন। জাহাঙ্গীর, শাহজাহার মারাঠাদের অভিজাতবর্গে অন্তর্ভুক্ত করেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়ের পর দক্ষিণী মুসলমানরা অভিজাত গোষ্ঠীতে নতুন সদস্য হিসাবে যোগদান করেন।

বিলাসবহুল জীবনযাপন অভিজাতবর্গের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, অলঙ্কার সমস্ত কিছুতেই ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়. কিন্তু সঞ্চয়ের কোন প্রবণতা ছিল না। ব্যবসা বা অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না। বিলাসী ঋণগ্রস্ত অভিজাতবর্গ পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের বোঝাস্বরূপে পরিণত হ'ন। এছাড়াও অভিজাতদের সংখ্যা বৃদ্ধি বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, সাধারণ কোন কর্মসূচীর অনুপস্থিতি, জায়গীরদারি ব্যবস্থার ব্যর্থতা—সবকিছু একত্রিত হয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অভিজাতবর্গকে এক গভীর সঙ্কটের সামনে নিয়ে আসে।

ব্যবসায়ী, বৃত্তিভোগী শ্রেণী যেমন হাকিম, বৈদ্য, কাজী, মোল্লা এবং মাঝারি গোছের সরকারি ইত্যাদি গোষ্ঠীকে নিয়ে মুঘল ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠিত ছিল। এরা ছিলেন সংখ্যালঘু ; রাজনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল এবং রাজপুরুষদের উপর নির্ভরশীল। অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক সঙ্কটে এই শ্রেণী কোন অগ্রগতির পথ দেখাতে পারেননি ; অথবা রাষ্ট্র, সরকার বা সম্রাটকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারেননি।

৩৪.২.১ জমিদার শ্রেণী

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে মুঘল ভারতে দুটি শক্তিশালী ভূস্বামী সম্প্রদায় লক্ষ্য করা যায়। পারসিক উৎসে তাদের সবসময় জমিদার বলে উল্লেখ করা হয়েছে ; অপরটি হ'ল রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত "জায়গীরদার সম্প্রদায়"। উভয় সম্প্রদায়ই কৃষকের উৎপাদনের উদ্বৃত্ত সম্পদেও ভাগ বসাতেন। যদিও এই উদ্বৃত্ত সম্পদ সংগ্রহ করার মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য দেখা যায়।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই জমিদারেরা জমি ভোগদখল করে আসছিলেন। তুর্কী শাসকেরা জমিদারের অবস্থাকে পরিবর্তন না করে তাদের সঙ্গে এক ধরনের বোঝাপড়া করে নিয়েছিলেন। জমিদারেরাও বিনিময়ে তুর্কী শাসকদের আনুগত্য স্বীকার করেন। মুঘলদেরও মেনে নিতে হয়েছিল যে জমিদারেরা রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি অংশ ; দেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। এর ফলে বৃহৎ জমিদারেরা সামন্ত প্রভু হিসাবে রাষ্ট্রকে সামরিক তথা অন্যান্য রকমের সাহায্য দিতে রাজি হয়।

এই বোঝাপড়ার পরিবেশ বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় না কারণ প্রায়শই জমিদার শ্রেণী শাসকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে খাজনা বাকি ফেলে রাখা, এবং রাষ্ট্রের জমি অধিকার করা, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত শুল্ক আদায় করে জনগণের দুঃখের কারণ হ'তেন। কৃষকেরা অত্যাচারিত হওয়া সত্ত্বেও জমিদারদের উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। একমাত্র যখন সামরিক শাসকেরা জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন তখনই দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসত এবং স্থিতাবস্থা বজায় থাকত। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলি জমিদারদের স্বার্থে আঘাত করলেই জমিদারেরা বিক্ষুব্ধ হ'তেন। নানারকম প্রক্রিয়ায় নিজেদের ক্ষুদ্র আঞ্চলিক স্বার্থকে বজায় রাকার ঝন্যে শাসশক্তির রাজনৈতিক সংহতিকরণের প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করতেন। যখনই সুযোগ পেতেন তখনই রাষ্ট্রশক্তিকে বাধা দিতেন। দজমিদার ও শাসক শক্তির এই প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব সমগ্র মধ্যযুগের ভারতে লক্ষ্য করা যায়।

জমিদারেরা মাঝে মাঝে অবাধ্য হয়ে উঠতেন। কারণ ভাড়াটিয়া সৈন্যবাহিনীর ব্যবহার জমিদরাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। মুঘল রাজ্যের সর্বত্র এই ধরনের জমিদারদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং জমি অতবা জমির উদ্বৃত্ত সম্পদের জন্যে লড়াই মুঘল ভারত সমেত সমগ্র মধ্যযুগের ভারতের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক। এই সমস্যা থেকেই অপরাপর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। জমিদারদের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে মুঘল শাসকশক্তি নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন : যেমন (ক) বৃহৎ জমিদারিকে ভেঙে ক্ষুদ্র জমিদারিতে পরিণত করা অথবা ভিন্ন গোষ্ঠীর নেতাকে অপর একটি এলাকার জমিদারীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করা ; (খ) আনুগত্যহীন বিক্ষুব্ধ জমিদারদের উচ্ছেদকরণ ; (গ) প্রাদেশিক ও জেলা স্তরে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের হাতকে শক্ত করা ; (ঘ) এসব ব্যবস্থা সত্ত্বেও আকবর জমিদারদের রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করার জন্যে মনসবদারী ব্যবস্থা গ্রহণ করবার সুযোগ তাদের সামনে খুলে দিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও জমিদারদের রাষ্ট্র সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়নি। শ্রেণী হিসাবে প্রায়ই তারা মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরোধিতা করতেন। মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থা যত প্রসারিত হয়েছে জমিদার শ্রেণী তত বেশি করে নিজেদের সুসংহত করে রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেছেন। জমিদার শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে না পারার ফলে ভবিষ্যতে মুঘল শাসকগোষ্ঠী জমিদারদের প্রতি সঠিক নীতি নির্ধারণে ব্যর্থ হয়।

রাষ্ট্রীয় সংহতির পরিবর্তে আঞ্চলিকতার মনোভাব গড়ে তোলা এবং তাকে শক্তিশালী করার পিছনে জমিদার শ্রেণীর ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র দেশব্যাপী তাদের বিস্তৃতি থাকার জন্যে কোন কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষে তাদের উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবে তার অধিকাংশ সময় রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সহযোগিতার পরিবর্তে বৈরিতার মনোভাব অবলম্বন করতেন। এদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন ছিল। সম্রাটের দক্ষতা, সামরিক শাসকদের উদ্যোগ, দক্ষতা এবং জনগণের অধিকাংশের সক্রিয় সমর্থনের উপর এইসব নীতি প্রণয়ন করা সম্ভব ছিল।

সুতরাং জমিদার শ্রেণী ছিল রাষ্ট্রের পক্ষে এক বিরাট সমস্যাস্বরূপ। মুঘর রাষ্ট্রব্যবস্থা এদের মিত্রতা

আদায় করতে পারেনি কেননা প্রায় সমস্ত জমিদার জাতি (caste) বা গোষ্ঠী (clan)-কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এরা অনেকেই ছিলেন প্রভাবশালী জাতির অন্তর্গত বা নিজেরাই ছিলেন গোষ্ঠীপতি—অনেকেরই নিজস্ব সৈন্যসামন্ত ও দুর্গ ছিল। স্থানীয়ভাবে ক্ষমতা ভোগ করতেন বলেই এদের মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা বোধ গড়ে উঠেছিল ; কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন বলবৎ করা বা ভূমিরাজস্ব আদায় করার সময় মুঘল শাসকদের এদের উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। জমিদার শ্রেণীর আনুগত্যের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে অধ্যাপক রিচার্যস এবং অধ্যাপক মুজাফ্ফর আলমকে এক দীর্ঘ বিতর্কে অবতীর্ণ হ'তে দেখা যায়।

৩৪.২.২ জায়গীরদার এবং অন্যান্য স্বত্বাধিকারীরা

তুর্ক-আফগান শাসকদের সময় ইক্তাদার নামে নতুন এক ভূস্বামী সম্প্রদায়েরসৃষ্টি হয় এবং ইক্তাদারি ব্যবস্থা মুঘল যুগে আরও বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে জায়গীরদারি ব্যবস্থায় রূপ নেয়। প্রশাসন পরিচালনা এবং ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের জন্য তুর্কী শাসকেরা দেশকে কয়েকটি ইক্তাতে ভাগ করেন। ইক্তার প্রধানকে ইক্তদার বলা হ'ত। নিজস্ব খরচ বাদ দিয়ে আদায়ীকৃত ভূমিরাজস্বের সবটুকুই রাষ্ট্রকে পরিশোধ করতে হ'ত। জায়গীরদাররা পরবর্তীকালে প্রায় একই কাজ করতেন। তবে সামরিক নেতা হিসাবে সম্রাটের প্রয়োজনে তাকে নির্দিষ্ট সংখ্যায় সৈন্য সরবরাহ করতে হ'ত।

জায়গীরদারদের ক্ষমতা ও অবস্থান সম্পূর্ণভাবে সম্রাটের ইচ্ছার উপর নির্ভর করত। বংশগৌরব ও মর্যাদা জায়গীরদারি পাবার পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় উপাদন ছিল। কিন্তু জমিদারদের মত তাদের জমির উপর কোন উত্তরাধিকারসূত্রে অধিকার বর্তাত না। অনেক সময়ই তাদের এক জায়গীর থেকে অন্য জায়গীরে স্থানান্তরিত হ'তে হ'ত। রাষ্ট্র বা সম্রাটকে তারা যে সেবা করতেন তার বিনিময়ে তারা নগজ টাকার পরিবর্তে জমির আয় ভোগ করতেন। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে পিতার জায়গীরদারি পুত্রকে অর্পণ করা হ'ত এবং ক্ষেত্রবিশেষে জায়গীরদারদের নগদ টাকায় বেতন দেওয়া হ'ত। কিন্তু এসবই ছিল নিয়মের ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়।

সুতরাং সরকারি আমরা হিসাবে জায়গীরদারদের জমির ব্যাপারে নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা বা অধিকার ছিল না। সম্রাটের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্যে তারা স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করতেন এবং কৃষির বিস্তার ও উন্নয়নে উৎসাহ দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পন্ন করতেন, সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে অনাবাদী জমিকে আবাদযোগ্য করা হ'ত, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় জায়গীরদারদের তত্ত্বাবধানে কৃষকদের সরকার থেকে খয়রাতি সাহায্য দেয়ো হ'ত। কৃষি ও কৃষকের উন্নতির সঙ্গে তাদের নিজেদের আর্থিক সমৃদ্ধি জড়িত একথা অধিকাংশ জায়গীরদার মনে করতেন।

জমিদারের মত জায়গীরদারেরা জমিকে সম্পদের একমাত্র উৎস বলে মনে করতেন। তারা সবসময় জায়গীরদারীকে স্থায়ী ভূ-সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালাতেন। দুর্বল সম্রাটদের বশীভূত করে তারা নিজে উদ্দেশ্য পূরণ করতেন। জায়গীরদারি ব্যবস্থার মধ্যে স্বতঃবিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। দেশব্যাপী তাদের উপস্থিতি রাষ্ট্রীয় ঐক্যকে সম্ভব করেছে আবার অন্যদিকে স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে রাষ্ট্রীয় ঐক্যকে দুর্বল করেছেন।

সম্রাটের নিচেই আর্থিক ও সামরিক দিক দিয়ে জায়গীরদার ও জমিদারদের বর্ণনা করা যায়। সমসাময়িক সমাজে অন্য কোন শক্তি তাদের সমকক্ষ ছিল না। ঋণগ্রস্ত, রাজনৈতিক চেতনাহীন কৃষককুল সংখ্যায় বেশি হ'লেও ক্ষমতাভোগী শ্রেণী হিসাবে ছিল একেবারেই গুরুত্বহীন। এশিয় উৎপাদন প্রথার বিশিষ্টতার জন্যে বণিক সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। তাছাড়া অভিজাত শ্রেণীই ছিলেন বণিকদের প্রধান ক্রেতা। এর ফলে তারা অভিজাতদের কৃপার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। দেশের সম্পদ উৎপাদনে ভূমি-রাজস্বের তুলনায় বাণিজ্য ও শিল্প উৎপাদনের স্থান ছিল কম গুরুত্বপূর্ণ। এই অবস্থায় জায়গীরদারদের বিকল্প কোন রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করা তাদের পক্ষে ছিল স্বপ্নাতীত।

জমিদরা ও জায়গীরদার ছাড়াও মধ্যযুগের ভারতে এারও কয়েকটি শ্রেণী দেখা যায়, যারা কৃষকের উদ্বৃত্ত সম্পদ আত্মসাৎ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পুরুষানুক্রমে হৈসব গ্রামীণ কর্তৃপক্ষেরা কৃষকের অতিরিক্ত সম্পদ আহরণ করতেন। তাদের কৃষক ও জমিদারের মধ্যবর্তী শ্রেণী হিসাবে গণ্য করা যায়। জনতার ঠিক ওপরের স্তরে এদের অবস্থান থাকায় হিন্দু ও ইসলামীয় সংস্কৃতি বিনিময়ে এদের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

৩৪.৩ অভিজাত শ্রেণীর বিন্যাস, গঠন ও চরিত্র

মুঘল সম্রাট আকবরের সময় থেকেই অভিজাত শ্রেণী একটি সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। সুলতানি আমলে ভূস্বামী সম্প্রদায়কে অভিজাত বলে গণ্য করা হ'ত না এবং হিন্দুরা রাজনৈতিক ক্ষমতার কোন অংসীদার ছিল না। হুমায়ুন প্রথমে তার সভাসদদের তিনটি স্তরে বিভক্ত করেন। এই তিনটি স্তরকে আবার বারোটি বিভাজন করা হয়। হুমায়ুনের রাজত্বকালের স্বল্পতার জন্যে এই বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

সরকারি কর্মচারীদের সুসংগঠিত করার জন্যে আকবর প্রথম মনসবদারি প্রথাকে ঢেলে সাজান. সরকারি কর্মচারীদের প্রায় সকলেই ছিলেন সামরিক দায়িত্বসম্পন্ন। প্রত্যেকেই ছিলেন সেনাবাহিনীর অন্তর্গত। প্রত্যেকের জন্যে সম্রাট দুটি করে সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিতেন। তাদের একটিকে বলা হ'ত "জাত", অপরটিকে বলা হ'ত "সওয়ার"। এই সংখ্যা দুটি সামরিক সংগঠনে সরকারি কর্মচারীদের অবস্থান সূচিত করত। মনসবাদারি প্রথার সর্বনিম্ন মান ছিল ১০ (দশ) এবং সর্বোচ্চ ছিল ৫০০০ (পাঁচ হাজার)। "জাত" পদ ছিল প্রত্যেক মনসবদারের ব্যক্তিগত মর্যাদার সূচক আর সওয়ার পদ দ্বারা বোঝা যেত তিনি কতজন সৈন্য রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। যারা মনে করেন মনসবদারি প্রথা আকবরের পূর্বেই প্রচলিত ছিল, তাঁদের মতে সামরিক বিভাগকে শক্তিশালী করার জন্যে রাজত্বের একাদশ বছরে (১৫৬৫-৬৬) আকবর এই ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করেন। এব্যাপারে তাকে প্রচলিত কায়েমী শক্তির সঙ্গে একটি বোঝাপড়ায় আসতে হয়েছিল "সওয়ার" পদ চালু করে এবং তার উপর জোর দিয়ে প্রত্যেক রাজকর্মচারীর সামরিক দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া হ'ল। জায়গীর থেকে উপার্জন অনুযায়ী সৈন্যসামন্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা বাধ্যতামূলক হ'ল। এরপর রাজত্বের অষ্টাদশ বছরে (১৫৭৩-৭৪) মনসবদারি প্রথা

প্রচলন করা হ'ল। একটিমাত্র সংখ্যাসূচক পদ ধার্য করা হ'ত যা নির্ধারণ করে দিতো সেই রাজকর্মচারী কতসংখ্যক ঘোড়া এবং ঘোড়সওয়ার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। যেহেতু বাস্তবে খুব কমসংখ্যক কর্মচারীই এই দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হ'তেন, তাই তাঁর রাজত্বের চল্লিশতম বছরে (১৫৯৫-৯৬) আকবর তার মনসবদারদের তিনটি ভাগে বিভক্ত করলেন। বিভাজনের ভিত্তি ছিল পদ অনুযায়ী কে কত সংখ্যক সওয়ার রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। এর ফলে সামরিক বিভাগে "সওয়ার" পদটি একটি নতুন মাত্রা লাভ করে এবং ১৫৯৭ সাল থেকে "সওয়ার" ও "জাত" মনসবদারি প্রথার ভিত্তিস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

এই দুটি পদ স্থির করে দিত কোন কোন মনসবদারেরা সরকারের কাছ থেকে কি পরিমাণ অর্থ দাবি করবেন। "জাত" পদ নির্দিষ্ট করত তার ব্যক্তিগত বেতন, "সওয়ার" পদ সূচিত করত সামরিক দায়িত্ব অর্থাৎ ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কত অর্থ তাদের সরকার থেকে দেওয়া হবে। বেতনদানের পদ্ধতি অভিজাত শ্রেণীর চরিত্রকে পরিবর্তন করে দেয় অর্থাৎ অভিজাচত শ্রেণী রাদজার আমরায় পরিণত হয়। প্রত্যেক সওয়ার পিছু কত অর্থ পাওয়া যাবে তা নিয়ে মোরল্যাণ্ডের বক্তব্যে পরবর্তীকালে ইরফান হাবির সংশয় প্রকাশ করেছেন। একটি জটিল হিসাব-নিকাশ পদ্ধতির ভিতর দিয়ে এই দাম নির্ধারিত করা হ'ত। তবে এখানে একটি বৈষম্য ছিল। বহিরাগত অভিজাতেরা বেশি দাম পেতেন এবং ভারতীয় অভিজাতেরা অনেক কম অর্থ পেতেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে সৈন্যাধ্যক্ষরা তাদের ঘোড়া এবং ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের পর্যবেক্ষণের জন্য হাজির করতেন বকসির কাছে। তখন আবার নতুন করে ঘোড়া এবং ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের দাম নির্ধারিত হ'ত। রাজত্বকালের চল্লিশ বছরে আকবর এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করেন। ১৬০৫ সালে এক ঘোড়ার সওয়ারদের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। এই পদের দাম ছিল কম এবং পরিবর্তনযোগ্য। এই হিসেব অনুযায়ী যাপরা পাওয়ানা আদায় করতেন তারা কেউ পদ অনুযায়ী সৈন্যসামন্ত রাখতেন না এবং তা আশাও করা হ'ত না।

মনসবদারদের মধ্যে যারা নগদ টাকায় বেতন পেতেন তাদের বলা হ'ত মনসবদার-ই-নগদি আর বাকিদের জন্য ধার্য করা হ'ত নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি বা জায়গীর জমি থেকে আদায়িকৃত রাজস্ব বা "জমা"র পরিমাণ। মনসবদারদের নির্দিষ্ট বেতন ও সৈন্য রক্ষণাবেক্ষণের সমান এই জমির উপর তার কোন অধিকার থাকত না। সম্রাটের ইচ্ছানুযায়ী তাদের এক জায়গীর থেকে অন্য জায়গীরে স্থানান্তরিত হ'তে হ'ত। এগুলিকে বলা হ'ত "তনখা জায়গীর"। এছাড়াও ছিল "ওয়াতন জায়গীর"। যেগুলি ছিল বংশানুক্রমিক এবং সেখানে কোন বদলির ব্যবস্থা ছিল না। স্বয়ংশাসিত এই জায়গীরগুলির ভূমিরাজস্ব রাজ্য বা জমিদার নির্ধারিত করতেন। "ওয়াতন জায়গীরের" বহুবিধ সুবিধার জন্যে মুঘল রাজত্বের শেষ দিকে বহু মনসবদার তাদের "তনখা-জায়গীর"কে "ওয়াতন জায়গীরে" পরিবর্তিত করতে সচেষ্ট হ'ন।

মনসবদার পদের নিয়োগকর্তা ছিলেন সম্রাট স্বয়ং এবং তিনিই তাদের বদলি ও পদচ্যুতির আদেশ দিতেন। এর ফলে মনসবদারেরা রাষ্ট্র, সম্রাট বা কোন আদর্শের প্রতি নয় ব্যক্তিগতভাবে একমাত্র সম্রাটের প্রতি অনুগত থাকতেন। যেহেতু প্রত্যেক মনসবাদর ছিলেন সামরিক বিভাগেল কর্মচারী, তাই সম্রাটের ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং সামরিক সাফল্যের উপর সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটত। সম্রাট ও মনসবদারদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা হ'ল পৃষ্ঠপোষক ও পোষ্যের সম্পর্ক। সম্রাটই

ছিলেন তাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের হেতু। আকবর তার ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যের দ্বারা শাসকশ্রেণীর অকুণ্ঠ আনুগত্য লাভ করেছিলেন ; শাহজাহানের ব্যর্থতা সেই আনুগত্যের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। তাই আওরঙ্গজেব সিংহাসন অধিকার করেই রাজ্য বিস্তারের নীতিতে এগিয়ে যান। ১৬৬০ সালে শায়েস্ত খাঁর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে যুদ্ধ শুরু হয়, ১৬৬১ সালে পালামৌ অধিকৃত হ'ল এবং মীরজুমলা কুচবিহার অধিকার করেন। ১৬৬২ সালে মীরজুমলা আসাম অধিকার করেন। ১৬৬৩ সালে গুজরাটের একাংশ অধিকৃত হ'ল। ১৬৫৫ সালে জয়সিং শিবাজীর সাথে পুরন্দরের চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিকে মুঘল-মারাঠা সম্পর্কের দ্যোতক বলে মনে করা হয়। ১৬৬৫ সালে বিজাপুরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করা হয়। ১৬৬৬ সালে শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করেন। এই সমস্ত অভিযানের পিছনে একটা চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় তা হ'ল অভিজাতদের কাছে নিজেকে পূর্ববর্তী সম্রাট শাহজাহানের চেয়ে যোগ্য প্রমাণিত করা। কিন্তু পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভারত অভিযানের অসাফল্য তাঁকে অভিজাতদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে। কিন্তু অনুৎপাদক এইসব যুদ্ধের ফলে ব্যয়ভার ক্রমশ বাড়লতে থাকে, সেই অনুযায়ী রাষ্ট্রের সম্পদ বযৃদ্ধি হয় না। আয় ও ব্যয়ের এই ব্যবধান ক্রমশ এক অর্থনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি কররে। সম্রাট ও অভিজাতদের মধ্যে যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল তা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা সম্ভব হয় না এবং এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শাসকশ্রেণীর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলিকে প্রকট ও প্রকাশ্য করে তোলে।

মুঘল অভিজাতবর্গের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাকে ভালভাবে বুঝতে হ'লে অভিজাত শ্রেণীর স্তরবিন্যাস সম্পর্কে আরও কিছু জানা প্রয়োজন। অভিজাতচ নির্বাচন করার সময় 'কর্ম' নয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বংশগৌরবকেই মর্যাদা দেওয়া হ'ত ; তবে বিদ্যাবত্তা ও সামরিক কৃতিত্বকে অবহেলা করা হ'ত না। মনসবারের পুত্র এবং বংশধরেরা মনসবাদির পদের জন্য সবচেয়ে বেশি দাবিতদদার ছিলেন, এদের বলা হ'ত "খানাজাদ"। তবে এরা ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী অভিজাতবর্গের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। সামরাজ্য বিস্তারের প্রয়োজনে মুঘলরা নিয়মিত মিত্র অনুসন্ধান করেছেন। যখনই কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যোগ্যতার সাথে মুঘলদের ক্ষমতাকে প্রতিস্পর্ধা করেছেন, তখনই তাকে তাদের বশুভূত করার জন্যে মনসবদারি প্রথার আকর্ষণকে সামনে রেখে তাদের দাবিকে স্তিমিত করা হয়েছে। এর ফলে মুঘল শাসকশ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন জাতি ও শক্তির সমাবেশ ঘটেছে। কোন কোন মসয় অভিজাতদের অন্তর্দ্বন্দ্ব বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে মুঘল শাসকেরা নিজেরাই এই স্বাতন্ত্র্যকে উৎসাহ দিয়েছেন। এক দলের বিরুদ্ধে আর এক দলকে কাজে লাগানোর জন্যে নানারকম চিন্তাভাবনা করেছেন। এইভাবে সমগ্র শাসকশ্রেণীর মধ্যে একটি শক্তির ভারসাম্য বজায় রেখে নিজেদের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণকে অটুট রাখাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। রাজপুতদের সঙ্গে আকবরের মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনকে শক্তির ভারসাম্য তৈরির করার প্রচেষ্টা হিসাবে গণ্য করতে হবে। এছাড়াও মুসলমান এবং অ-মুসলমানকে নিয়ে একটি মিশ্র অভিজাতশ্রেণী গড়ে তোলাও আর একটি উদ্দেশ্য বলে গণ্য করা যেতে পারে।

"খানাজাদ" ভিন্ন অন্যান্য যারা মনসবদার নিযুক্ত হতেন তাদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় জমিদার এবং দেশীয় রাজন্যবর্গ। দেশজ ভূমিকেন্দ্রিক এই শক্তিকে মুঘলদের উপেক্ষা করার ক্ষমতা ছিল না। আকবার

জমিদরা শ্রেণীর মনোভাব পরিবর্তন করতে চাইলেন তাদের মনসবদার পদে নিয়োগ করে, তাদের নিজস্ব ভূসম্পত্তিকে "ওয়াতন জায়গীর" হিসাবে গণ্য করা হ'ত। নুরুল হাসান জমিদরা শ্রেণীর মধ্যে তিনটি স্তরের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। সবার উপরে ছিল শক্তিশালী স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী স্থানীয় রাজারা, এদের তলায় ছিলেন এক ধরনের মধ্যবর্তী জমিদার, একেবারে নিচের তলায় ছিলেন ক্ষুদ্র জমিদারেরা, যারা একাধারে সম্পন্ন কৃষক অপরদিকে জমিদার। প্রথম শ্রেণীর জমিদারদের মনসবদারের পদে উন্নীত করা হ'ত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর জমিদারদেরও ক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে তাদেরকে একটি সহযোগী শ্রেণীহিসাবে পরিণত করা হ'ত। এত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এরা ছিলেন একটি শক্তিশালী বিরোধী সম্প্রদায়।

মুঘল সম্রাটরা ছিলেন গুণগ্রাহী এবং ব্যক্তিগত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে নীতি নির্ধারণ করতে পারতেন বলেই বহিরাগত অভিজাতশ্রেণী যথা পারসিক, চাঘতাই, উজবেক সামরিক নেতৃবৃন্দের কাছে ভারতবর্ষ চিরকাল এক আকর্ষণীয় স্থান রূপে পরিগণিত হ'ত। মুঘল যুগে এরা দলে দলে ভারতে প্রবেশ করেছেন এবং উচ্চ-সামরিক পদ লাভ করেছেন। এদের সুযোগ্য নেতৃত্বে মুঘল স্থলবাহিনী অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হয়। মোরল্যান্ডের হিসেবমত শাহজাহানের রাজত্বকাল অবধি এদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকে, পরে ঔরঙ্গজেবের সময় থেকে এদের গুরুত্ব হ্রাস পায়। এর কারণ হিসাবে আতাহার আলি মধ্য এশিয়ায় রাজনৈতিক অবক্ষয়ের কথা বলেছেন। পিয়ারসন মনে করেন, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ভারতবর্ষের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল। আকবর বিদেশী শাসকদের ভারতীয়করণের কিছু চেষ্টা করেছিলেন। তার পরেই এই চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। বিদেশীদের ভারতীয়করণ কোন পরিকল্পিত ঐতিহাসিক নীতি ধরে হয়নি, হয়েছে সামাজিক বিবর্তনের হাত ধরে.

সুতরাং বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীকে শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করার ফলে মনসবদারদের মধ্যে ধর্ম, আঞ্চলিকতা, জাতি ইত্যাদির ভিত্তিতে উপদল গড়ে উঠেছিল। ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা যায় অন্তর্দ্বন্দ্ব যার সমাধান পরবর্তী কোন সম্রাটই করতে পারেননি। তুরানি, ইরানি, আফগান, শেখজাদা বা ভারতীয় মুসলমানদের বিপীতে ছিলেন রাজপুত, মারাঠা ও অন্যানা হিন্দুদের দল। তুরানি, ইরানী ইত্যাদি পশ্চিম জাতীয় অভিজাতদের বিরুদ্ধে দল হিসাবে ছিল আফগানদের দলটি। দক্ষিণ দেশীয় মনসবদারদের বিরুদ্ধে ছিলেন উত্তর ভারতীয় মনসবদারেরা। মদ্য এশিয়ার তুর্কিভাষী অঞ্চল থেকে আগত তুরানীরা এবং ইরাক/ইরান থেকে আগত ইরানীরা এক দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন। আবার তুরানীরা সুন্নী এবং ইরানীরা শিয়া ধর্মাবলম্বী হওয়ার জন্যে ধর্মীয় দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করা যায় না।

ভারত ও আফগানিস্তান প্রতিবেশী দেশ হওয়ার জন্যে এবং অতীতের ঐতিহাসিক পটভূমি অনেকটা এক হওয়ার জন্যে আফগান ওমরাহদের বোধহয় বিদেশী বলা যাবে না। বাবরের ভারত আক্রমণের সময় এরা ভারতে প্রবেশ করেন এবং মুঘল শাসন দৃঢ়বন্ধ করার কাজে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু আফগানদের সাম্রাজ্য তৈরির প্রচেষ্টা মুঘলদের চোখে সন্দেহভাজন করে তোলে। শাহজাহানের সময় খান-ই-জাহান-লোদীর বিদ্রোহ মুঘল-আফগান সম্পর্ককে সঙ্কটের মধ্যে নিয়ে আসে। আওরঙ্গজেব তার রাজত্বের প্রথম দিকে আফগান মনসবদারদের সন্দেহের চোখে দেখলেও তার রাজত্বের শেষ দিকে

আফগান মনসবাদরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বিজাপুর রাজ্য জয় করবার পর এই রাজ্যে চাকুরিরত আফগান মুঘল মনসবদারের পদ লাভ করে। অভিজাততন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে আশ্রয় নিলেও আফগানরা স্থানীয় শক্তির সঙ্গে মৈত্রী করে প্রায়শ সম্রাট বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতেন। কিন্তু দিল্লির দরবারে আফগানরা নিজেদের একটি দল হিসাবে উপস্থিত করতে পারেননি। আফগান শক্তির উপজাতীয় চেতনার জন্যে মুঘল শক্তির আভ্যন্তরীণ সংহতি অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

ভারতীয় মুসলমান বা শেখজাদারা ছিলেন কোন না কোন বিশেষ উপজাতির অন্তর্ভুক্ত যেমন চারহার, সঈদ। আকবরের সময় এরা ছিলেন স্থানীয়ভাবে বিশেষ শক্তিশালী। পরে ঔরঙ্গজেবের সময়ে এদের গুরুত্ব ও সংখ্যা হ্রাস পায়। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিকে বহু কাশ্মীরী মুসলমান মনসবদার পদে নিযুক্ত হ'ন এবং শেষ অবধি কাজ করেন। আফগানদের মতো রাজপুতরাও উপজাতীয় গোষ্ঠীগত চেতনা ছাড়তে পারতেন না ; কিন্তু শাসক হিসাবে জনগণের উপর নেতৃত্ব এবং হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে এদের অবস্থানগত সুবিধাকে আকবর উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তার রাজত্বে রাজপুতরা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেব কিছুটা সংকীর্ণ নীতি অবলম্বন করলেও রাজপুতদের সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করতে পারেননি।

সাম্রাজ্য দক্ষিণে প্রবেশ করলে যোদ্ধা জাতি হিসাবে মারাঠারা মুঘল সামরিক শক্তিতে যোগদান করে। মুঘল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে মারাঠাদের জায়গা করে দিতে ঔরঙ্গজেবের খুবই অসুবিধা হয়েছিল। এই সমস্যা যথাযথ সমাধান না করার ফলে পরবর্তীকালে মারাঠা নেতা শিবাজীকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক স্বাধীনতার আন্দালন গড়ে ওঠে। মারাঠা ও দক্ষিণী মনসবদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার ফলে মুঘল শাসকশ্রেণীর গঠনে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। হিন্দু-বিরোধিতা সত্ত্বেও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে হিন্দু মনসবদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। রাজপুতরা পৃথক গোষ্ঠী হিসাবে দুর্বল হ'তে থাকে। আফগান মনসবদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর চারহার সঈদ, তুরানি ও ইরানী দলের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন "খানজাদ" বা বনেদী বংশের ওমরাহরা।

মুঘল দরবারে দল ও রাজনীতি বৃদ্ধি পাবার ফলে বিভিন্ন বর্গীয় শক্তির সমাবেশ ঘটে। এরা বিভিন্ন দিক থেকে পৃথক ছিলেন। শিয়া ইরানী দলের সুন্নী তুরানি দলের মতপার্থক্য ছিল কিন্তু অভিজাত হিন্দু ও মুসলমান দলের সম্পর্ক মোটের উপর ভালই ছিল বলা চলে যদিও হিন্দুরা নিজেদের বর্ণের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সজাগ ছিলেন। পৃথক ঐতিহ্য, পৃথক ধর্ম, পৃথক ভাষা সত্ত্বেও মুঘল অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন একটি আভ্যন্তরীণ ঐক্য ছিল, যার ফলে তারা ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব অবধি একটি শক্তি হিসাবে কাজ করতে পেরেছিল। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর এদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলি ক্রমশ পরিস্ফুট হ'তে থাকে।

৩৪.৪ অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল অভিজাত শ্রেণীর সামনে সঙ্কট

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যের দ্রুত অবক্ষয় শুরু হয়। উপদলীয় কলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব মুঘল রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। শক্তিশালী প্রাদেশিক শাসকরা কেন্দ্রীয় সরকারের নামমাত্র

কর্তৃত্ব স্বীকার করে কার্যত স্বাধীন হয়ে পড়ে। মারাঠা বাহিনী দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অতিক্রম করে উত্তর ভারতের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। নাদির শাহ মুঘল সম্রাটকে বন্দী করে ১৭৩৯ সালে প্রকাশ্যে বিনা বাধায় দিল্লি লুণ্ঠন করে। সারা পৃথিবীর সামনে মুঘল সামরিক বাহিনীর অন্তঃসারশূন্যতা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মুঘল সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা আলোচনা করতে গেলে কোন ব্যক্তিকে দোষারোপ করার চেয়ে সমসাময়িক অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলিকে অনুধাবন করা প্রয়োজন। এটা সত্য যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় হস্তশিল্পের বিপুল চাহিদা ছিল। ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৃষিজাত দ্রব্য যেমন নীল, ইত্যাদির উৎপাদন বাড়িয়ে যাওয়ার দরকার ছিল। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও তা অর্থনৈতিক চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। জমির ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন এড়াবার জন্যে নতুন উৎপাদন পদ্ধতির কথা ভাবা হয়নি। দ্বিতীয়ত, অত্যধিক ভূমিরাজস্বের চাপে কৃষকের হাতে খাওয়া-পরা বাদ দিয়ে ভূমিরা উন্নতি করার মত কোন উদ্বৃত্ত থাকত না। তৃতীয়ত, সমাজব্যবস্থার মধ্যে কোন গতিশীলতা ছিল না। ক্রমবর্ধমান উৎপাদন যেসব এলাকায় হয়েছিল সেখানেও কৃষক ও মাঝারি জমিদারেরা এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারেননি। সময় এগিয়ে যাবার সঙ্গে রাষ্ট্রের চাহিদা বাড়তে থাকে এবং একসময় তা পূরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৬০৫ সালে জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণের সময় মনসবদারদের সংখ্যা ছিল ১১,৪৫৬ ; এই সংখ্যা ১৬৩৭ সালে আট (৮,০০০) হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষভাগে সংখ্যাটা গিয়ে পৌঁছয় ১১,৪৫৬। অভিজাতদের সংখ্যা প্রায় পাঁচগুণ বেড়েছে কিন্তু রাষ্ট্রের সম্পদ সেই অনুযায়ী বাড়েনি। উপরন্তু সম্রাটদের বিলাসবহুল জীবন ও বিলাসিতাকে অভিজাতরা অনুকরণ করতে থাকেন, ফলস্বরূপ রাষ্ট্রের সঞ্চিত সম্পদের বিনাশ ঘটতে থাকে।

৩৪.৪.১ রাজনৈতিক সমস্যা

মুঘল রাষ্ট্রনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অভ্যুত্থান এই যুগের অন্যতম রাজনৈতিক সমস্যা, বহু ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিদ্রোহ এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে সম্রাটকে স্বয়ং বিদ্রোহ দমন করতে যেতে হয়। যেমন জাঠ বিদ্রোহ, জাঠ কৃষকেরা ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে একবার প্রাথমিক পর্যায়ে, পরে ১৬৮৬ সালে দ্বিতীয় অভ্যুত্থান ঘটে। দ্বিতীয় বিদ্রোহটি ছিল অনেক ব্যাপক ও মারাত্মক। রাজপুত নেতা বিষাণ সিং ১৬৯১ সালে এই বিদ্রোহ দমন করেন। জাঠরা কোন রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি। আঞ্চলিক ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্রের চাহিদা পরবর্তীকালের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল।

জাঠদের মতই সৎনামী সম্প্রদায়রা ১৬৭২ সালে মুঘল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ বেছে নেয়। বিদ্রোহের তীব্রতা এত বেশি ছেল যে স্থানীয়ভাবে এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়নি। সম্রাট স্বয়ং রাজপুত সমরনায়ক এবং জমিদরাদের সাহায্যে এই বিদ্রোহকে দমন করেন।

১৬৭৫ সালে গুরু তেগবাহাদুরের প্রাণদণ্ডকে কেন্দ্র করে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে শিখদের রাজনৈতিক বিরোধ শুরু হয়। মুঘল-শিখ বিদ্রোহের দুটি সম্ভাব্য কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে। (এক) মুঘল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র গড়বার আহ্বান করে শিখ গুরু মুঘল রাষ্ট্রশক্তির সার্বভৌমিকতাকে বিপন্ন

করে তুলেছিলেন। (দুই) মুসলমান ফকির হাকিম আদমের সহযোগিতায় পাঞ্জাব প্রদেশে মুঘল রাষ্ট্রশক্তিকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। গুরুগোবিন্দ সিং পরবর্তীকালে শিখধর্মীয় সংগঠনকে একটি জাতীয়তাবাদী সামরিক চরিত্র দান করেন। মুঘল-শিখ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব পরবর্তী মুঘল ইতিহাসের নিয়মিত বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়ে।

যদিও এই আঞ্চলিক বিদ্রোহগুলি মুঘল সামরিক সংগঠনের বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারেনি ; মুঘল সেনাবহিনী ও অপরাজেয় এবং অপ্রতিরোধ্য নয় এই বিশ্বাস তারা ভেঙে দিয়েছিল এবং অপরদিকে এইসব বিদ্রোহ ঔরঙ্গাজেদবের মনে হিন্দুদের প্রতি অবিশ্বাসের মনোভাবকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। এছাড়াও হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিঘ্ন ঘটিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জাঠ ও শিখ বিদ্রোহের চেয়েও বেশি মারাত্মক ছিল ১৬৭৯ সালে রাজপুত নেতা যশোবন্ত সিং-এর মৃত্যুর পর মুঘল-রাজপুত রাজনৈতিক লড়াই। যশোবন্ত সিং অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সম্রাট উত্তরাধিকারী স্থির করার জন্যে ব্যস্ত হ'ন। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য জায়গীরদারের মতই যশোবন্ত সিং-এর কাছে রাষ্ট্রের অনেক পাওনা ছিল। সেই টাকা আদায় করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কার্যত মুঘলরা মারওয়ারে সাম্রাজ্যবাদী বিজেতা শক্তির মত ব্যবহার করতে শুরু করে। মারওয়ার দেশ এবং দেশবাসীকে বিরোধী ব্যক্তিতে পরিণত করে, অজিত সিং-এর ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা করে মুঘল সৈন্যরা মারওয়ার আক্রমণ করে এবং পরাজিত করে। এই পর্যায়ে মেবারের রাণা রাজ সিং অজিত সিং-এর পক্ষে যোগ দিয়ে মুঘল রাজপুত দ্বন্দ্বকে নতুন পর্যায়ে নিয়ে যায়। আঞ্চলিক বিদ্রোহ এখন প্রায় একটি জাতীয় বিদ্রোহের রূপ নেয়। ১৬৯৮ সালে রাজপুত নেতা অজিত সিং-এর অধিকার স্বীকার করে নিলে বিরোধের মীমাংসা হয় বটে কিন্তু ১৭০৭ সাল অবধি রাজপুত সমস্যার কোন পূর্ণাঙ্গ সমাধান হয়নি।

রাঠোর বিদ্রোহের পরও ছোট ছোট রাজপুত নেতারা ঔরঙ্গাজেবের পক্ষে ছিলেন এবং (দুই) মুঘল সামরিক শক্তি তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহের গুরুত্বকে অন্যত্র খুঁজতে হবে। দেশের প্রধান সামরিক শক্তিগুলিকে নিয়ে মুঘলরা মিত্র অভিজাত শ্রেণী গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। এখন থেকে সে প্রচেষ্টায় বাধা পড়তে শুরু করল। বিচ্ছিন্নবাদী স্বতন্ত্র শক্তিগুলিকে প্রতিরোধ করার পরিবর্তে তাদের শক্তি বৃদ্ধি হ'ল। দ্বিতীয়ত, রাজপুতদের অনুপস্থিতির ফলে ভবিষ্যতে মারাঠাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ল ; তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের সঙ্কটকালে রাষ্ট্রের সম্পদের বিনাশ মুঘল রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে এক গভীরতর সঙ্কটের দিকে পরিচালিত করল।

সপ্তদশ শতকের শেষ এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে মুঘল সাম্রাজ্য ও মুঘল শাসকশ্রেণীর পক্ষে যেটি সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা হ'লো মারাঠাদের উত্থান। সম্রাট সাহজাহানের সময়ই শাহজী ভোঁসলে প্রথমে পুনার আশেপাশে এবং পরে বালামোরে এক আধা স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন। শিবাজীরও প্রারম্ভিক লক্ষ্য ছিল পুনায় পিতার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করা, নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, জাতব্যবস্থার ঊর্ধ্বে ওঠা। বিজাপুর সরকার তাকে দমন করতে ব্যর্থ হ'লে মুঘল শক্তির সঙ্গে তার

রাজনৈতিক সংঘাত বাধে। সম্প্রতি বিজিত আহমদনগরের সীমান্তে শিবাজীর স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব মুঘল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার পক্ষে ছিল বিপজ্জনক। দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যের দক্ষিণপ্রান্ত এবং পশ্চিম উপকূলের সঙ্গে উত্তর ভারতের বাণিজ্যপথের উপর এক নতুন রাজ্য ছিল মুঘল-বাণিজ্যিক স্বার্থের পরিপন্থী। তৃতীয়ত, মুঘল অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে মুঘলদের পক্ষে দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলির ক্ষতি না করে শিবাজীর দাবি মেনে নেওয়া ছিল অসম্ভব। চতুর্থত, ঔরঙ্গজেব ব্যক্তিগতভাবে শিবাজীকে অপছন্দ ও অবিশ্বাস করতেন। পঞ্চমত, শিবাজীকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে তার পিছনে জাতীয় জনজাগরণের শক্তিকে অবহেলা করে ঔরঙ্গজেব রাজনৈতিক সুবিবেচনার পরিচয় দেননি।

শিবাজীকে দমন করার প্রাথমিক ব্যর্থতাসমূহ মুঘল সাম্রাজ্যের মর্যাদাকে বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ করল। ১৬৬৫ সালে রাজপুত নেতা জয় সিং-এর সাফল্য এবং পুরন্দরের চুক্তি এই মর্যাদাকে কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

১৬৭৫ সালে দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়কে কেন্দ্র করে মুঘল-মারাঠা কলহ একটি নতুন দিকে মোড় নেয়—(এক) "চৌথ" ও "সরদেশমুখী"র দাবি মুঘল সার্বভৌমিকতার ধারণার প্রতিপন্থী ; (দুই) যেভাবে শিবাজী দাক্ষিণাত্যে এই কর আদায় করতেন তা দেশের বাণিজ্য ও শিল্পের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল ; (তিন) শিবাজীর ব্যবস্থা শিল্পসমৃদ্ধ পশ্চিম উপকূলকে জনবহুল ও সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র উত্তর ভারতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। এই পর্যায়ে তিনি শিবাজী পুত্র শম্ভুজীকে দেশদ্রোহিতার অপরাধে প্রাণদণ্ড দেন ; কিন্তু শম্ভুজীর পুত্র শাহুর প্রতি আশ্চর্যজনক উদার নীতি অবলম্বন করেন। ১৬৮৯ সাল থেকে ১৬৯৮ সাল অবধি ঔরঙ্গজেবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মারাঠা রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র "জিঞ্জি" অধিকার করা। তার ধারণা ছিল এই যে "জিঞ্জি" অধিকার করতে পারলে মারাঠারা স্বেচ্ছায় মুঘল অধীনতা মেনে নেবে। ব্যক্তিগতভাবে মারাঠা নেতাদের দমন করা হয়ত সম্রাটের পক্ষে কঠিন ছিল না এবং ১৬৯৮ সাল অবধি পরিস্থিতিকে মুঘলদের পক্ষ থেকে খুব বেশি প্রতিকূল বলা যাবে না। কিন্তু ঔরঙ্গজেব মারাঠা গণশক্তিকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেননি। মারাঠা গণজাগরণের ফলে মুঘল সামরিক শক্তিকে বিপর্যয়ের সামনে পড়তে হয়। শ্রেষ্ঠ মুঘল সেনাপতিদের উপস্থিতিও অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারল না। এই অবস্থায় আলাপ-আলোচনা শুরু করা ছাড়া অন্য কোন পথ রইল না। ১৭০০ সালে ঔরঙ্গজেব তারাবাঈ-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ১৭০৩ সালে মারাঠা নেতা ধনা যাদবের নেতৃত্বে আলাপ-আলোচনা নতুন করে শুরু হ'ল। ১৭০৬ সালে জুলফিকার আলির নেতৃত্বে অপর একটি আলোচনা কার্যকরী হ'ল না। মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান সর্বভারতীয় মুঘল সাম্রাজ্য প্রসারের পথে ছিল মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। প্রথমত, মারাঠা-রাজপুত অভিজাত শ্রেণীর অনুপস্থিতি—মুঘল রাষ্ট্রের অভিজাতদের কাঠামোতে পরিবর্তন নিয়ে আসে। দ্বিতীয়ত, প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সমস্ত মারাঠা সর্দারদের দাবি মেনে নেওয়া ছিল অসম্ভব।

সুতরাং এই সমস্ত রাজনৈতিক বিপর্যয় জায়গীরদারি ব্যবস্থা, যা ছিল মুঘল অভিজাতদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র তাতে আঘাত নিয়ে আসল। রাজনৈতিক বিপর্যয় জায়গীরদারি ব্যবস্থায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে এক বিরাট সঙ্কটের সূচনা করেছিল।

৩৪.৪.২ জায়গীরদারি ব্যবস্থার সঙ্কট

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মুঘল শাসক সম্প্রদায়কে যে দুরূহ অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয় সাধারণভাবে তাকে বলা হয় জায়গীরদারি সমস্যা। প্রশাসনের ব্যয়, ক্রমবর্ধমান যুদ্ধের খরচ মেটান এবং শাসকশ্রেণীর বিলাসবহুল জীবনযাত্রার খরচ যোগানোর মত উদ্বৃত্ত সম্পদ রাষ্ট্রের হাতে ছিল না। মুদ্রার মূল্যহ্রাস একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা রূপে দেখা দেয়, যার ফলে ভারতকে পশ্চিমী দেশগুলির মত মূল্যবৃদ্ধিজনিত সমস্যার সামনে পড়তে হয়। সেই সঙ্গে শাসকশ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয় ও প্রত্যাশাও বেড়ে যায়। অধ্যাপক আতাহার আলি দেখিয়েছেন যে, সপ্তদশ শতক থেকেই বিলাসসামগ্রীর দাম বাড়তে থাকে। ফলে বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত মুঘল রাজপুরুষদের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যায়। ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গাতি রেখে এই অবস্থায় আয় বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল, কিনতু ভারতীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। কৃষি উৎপাদন এবং কৃষিজ পণ্যের মূল্য বাড়লেই তবেই ভারতীয়দের আয় বাড়বার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু শাসক-গোষ্ঠীর প্রয়োজন যে হারে বেড়েছিল অর্থনীতির নিয়ম অনুসারে উৎপাদন সে হারে বাড়েনি। কৃষির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল, অন্যদিকে পণ্যসামগ্রীর মূল্য প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াল। এর ফলে "জমা" নির্ধারিত রাজস্বের বৃদ্ধির পরিমাণ হয়ে দাঁড়াল প্রায় প্রান্তিক এবং প্রায়ই "সাসিলের" (আদায়ীকৃত রাজস্ব) পরিমাণ "জমা"র চেয়ে অনেক কম হ'ত। এই অবস্থায় জায়গীরদারদের মধ্যে বণ্টনযোগ্য উৎকৃষ্ট জায়গীরের (যেখানে রাজস্ব পূর্ণমাত্রায় আদায় হয়) পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। অন্যদিকে মনসবদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার ফলে অসংখ্য মনসবদারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। এই দ্বন্দ্বকে আরো তীব্র করেছিল জায়গীরের অসম বণ্টন ও মুষ্টিমেয় মনসবদারদের হাতে সম্পদের ভারসাম্যহীন কেন্দ্রকরণ।

সম্রাট শাহজাহানের সময়ে.ই "জমা" এবং "হাসিল"-এর মধ্যে পার্থক্য জায়গীরদারি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। অনেক সময়েই মনসবদারেরা যে জায়গীর পেতেন তার "জমা" কাগজে-কলমে তাদের প্রাপ্য আয়ের সমান হ'লেও সমগ্র বৎসরের আদায়ীকৃত রাজস্ব তার অর্ধেক এমনকি দাক্ষিণাত্যের এক-চতুর্থাংশের বেশি হ'ত না। অন্যদিকে "আইন-ই-আকবরীর" সময় থেকে শাহজাহানের রাজত্বকালের দশম বর্ষের (১৬৩৭)-এর মধ্যে মনসবদারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অধ্যাপক হাবিবের হিসাব অনুযায়ী ১৬০৫ থেকে ১৬২১ সালের মধ্যে "জাত" মনসবের সত্যিকারের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে ; "সওয়ার" মনসবের সংখ্যা ঠিক করে বৃদ্ধি পেয়েছিল তার হিসেব করা অপেক্ষাকৃ-ত কঠিন। মনসব পদের সংখ্যা বৃদ্ধি স্বভাবতই কোষাগারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ইতিপূর্বে জাহাঙ্গির ও শাহজাহান বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজের দ্বারা সমস্যাকে যুগোপযোগী করকবার চেষ্টা করেছিলেন। শাহজাহান আর্থিক দায়িত্ব কমানোর সঙ্গে সঙ্গে সামরিক দায়িত্বও কিছু কমিয়ে আনেন। ফলে অধ্যাপক হাবিবের মতে, মনসবদারদের খুব বেশি ক্ষতি হয়নি, এছাড়া দাক্ষিণাত্য বাদ দিয়ে সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ থেকে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গাতি রেকে আয় বাড়ছিল, কিন্তু শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম দুই দশকে 'জমা" ও "হাসিলের" মধ্যে পার্থক্য উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়লছিল। অবস্থার উন্নতিকল্পে শাহজাহানকে কতকগুলি সংস্কারমূলক ব্যবস্থা নিতে হয়।

শাহজাহানের সংস্কার স্থায়ীভাবে সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। ব্যয় সংকোচ করে, নতুন কর ধার্য করে, কৃষি্র সম্প্রসারণের দিকে নির্দেশ দিয়েও ঔরঙ্গাজেব অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারেননি। দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের ফলে বহুসংখ্যক সামরিক নেতাকে মুঘল শাসনযন্ত্রের প্রতি অনুগত করবার জন্যে মনসবদারের পদ দিতে হয়েছিল। এর ফলে জমির অনুপাতে "মনসবদারের সংখ্যা" অনেক বেড়ে যায়। দাক্ষিণাত্য যুদ্ধ ও মারাঠা আক্রমণের ফলে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে সমভাবেই শাসনব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছিল। ফলে অধিকাংশ স্থান থেকেই জায়গীরদারেরা তাদের প্রাপ্য আয় আদায় করতে পারতেন না ; আয়কে সুনিশ্চিন্ত করবার জন্যে অধিকাং জায়গীরদারেরা উত্তর ভারতে "জায়গীর" চাইতেন। আবার ভাল জায়গায় "জায়গীর" পেলেও মনসবদারদের নিশ্চিন্ত হওয়ার কোন অবকাশ থাকত না কারণ বদলির আশঙ্কা সবসময়ই থাকত। বদলি হবার পর "জায়গীর"দারদের 'jদায়গীর"হীন অবস্থায় অনেকদিন প্রায় চার/পাঁচ বছর কাটাতে হ'ত। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য জয় করে এই সমস্যার সমাধান করার দাবি ওঠে। কিন্তু তাতেও সমাধান করা যেত না, কারণ দাক্ষিণাত্য ছিল বরাবরই ঘাটতি এলাকা।

ঔরঙ্গাজেব বিজাপুর, গোলকুণ্ডা জয় করবার পরেও সমস্যা একইরকম থেকে গেল করাণ তিনি নববিজিত অঞ্চলে মুঘল শাসনব্যবস্থাকে সংগঠিত করে অধিকৃত অঞ্চলের ভূসম্পত্তিকে যথাযথবাবে কাজে লাগাতে পারেননি। উৎকৃষ্ট জমিকে "খালিসা" জমিতে পরিণত করে অনুৎকৃষ্ট জমিতে তিনি মনসবদারদের মধ্যে বিতরণ করেন। এইসব অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায় করা ভয়ঙ্কর কঠিন কাজ ছিল। জে. এফ. রিচার্যসন তাই মন্তব্য করেছেন, "জায়গীর সমস্যা আসলে কৃত্রিম। এর প্রধান কারণ সম্পদের ঘাটতি নয়, ঔরঙ্গাজেবের ভ্রান্ত নীতি।"

ঔরঙ্গাজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার অতিরিক্ত সম্পদ কৃষির উন্নতির কাজে না লাগিয়ে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের কাজে লাগিয়েছিলেন। এর ফলে ব্যয়ভারের তুলনায় সম্পদের ঘাটতি বাড়ে। "খালিসা" ও "জায়গীর" উভয় প্রকার জমি থেকেই "হাসিলের" পরিমাণ জমার থেকে কমে আসছিল। জায়গীর সমস্যার মূল চরিত্র প্রধানত সামাজিক। শুধুমাত্র সরকারি নীতির পরিবর্তন করে বা কৃষির সম্প্রসারণ করে এই সমস্যার সমাধান করা যেত না। নতুন কারিগরীবিদ্যা প্রয়োগ করে শিল্পের উন্নতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করতে পারলে সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। এর জন্যে দরকার ছিল সামাজিক পরিবর্তন এবং তা ছিল কোন একজন সম্রাটের সাধ্যের বাইরে।

৩৪.৪.৩ অদূরদর্শী মুঘল অভিজাতদের আত্মক্ষয়ী সংগ্রাম

মুঘল শাসকশ্রেণী ও মুঘল অভিজাতদের উপর জায়গীরদারি সমস্যার প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূরপ্রসারী। উপার্জন কমে যাওয়ায় বেশিরভাগ মনসবাদর তাদের "সওয়ার" পদ অনুযায়ী উচিত সংখ্যক সৈন্য রক্ষণাবেক্ষণ করতেন না। মনসবদারি ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে থাকে। জাহাঙ্গীরের সময়ে "সওয়ার" ও "জাত" এই শব্দ দুটি অর্থহীন সংখ্যায় পরিণত হয়েছিল। শাহজাহান সংস্কার করে কিছুটা পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন ; মনসবদারদের সামরিক দায়িত্ব বেঁধে দিয়েছিলেন। কিন্তু মৌলিক কোন পরিবর্তন তিনি আনেননি। ঔরঙ্গাজেবের রাজত্বে শেষদিকে মনসবদারদের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে থাকে। তখন মনসবারেরা তাদের দায়িত্ব চূড়ান্তভাবে অবহেলা করতে থাকেন এবং সম্রাটের

অনুপস্থিতিতে তাদের বাধ্য করানোর মত কোন ব্যক্তি বা সংস্থা ছিল না। এই অবস্থার ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকে। সম্রাট মুহম্মদ শাহের আমলে কয়েকজন উচ্চপদাধিকারী ছাড়া কেউ তাদের দায়িত্ব পালন করতেন না।

জায়গীররের অভাব, উৎকৃষ্ট জায়গীরের জন্য রেষারেষি মুঘল শাসকশ্রেণীর অন্তর্নিহিত দদ্বন্দ্বকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসল। সাম্রাজ্যের স্বার্থ ভুলে গিয়ে তারা নিজেদের স্বার্থ নিয়ে লড়াই করতে লাগলেন। দক্ষিণী মনসবদারদের পক্ষপাত দেখানো জন্যে "খানাজাদ" মনসবদারেরা রুষ্ট হ'লেন এবং হৃত মর্যাদা ফিরে পাবার জন্যে প্রাণপন চেষ্টা করতে লাগলেন। হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বাড়তে লাগল। উৎকোচের দ্বারা বশীভুত করে ভাল জায়গীর পাবার প্রচেষ্টা শাসকশ্রেণীর উচ্চস্তরে দুর্নীতি নিয়ে এল।

মুঘল যুগের শেষ দিকে অভিজাতশ্রেণী তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ইরানি দলের নেতা ছিলেন আসাদ খাঁ এবং তার পুত্র জুলফিকার খাঁ, তুরানি দলের নেতা চিলেন গাজি-উদ্দীন-খান ফিরোজ এবং পুত্র ছিল কুলিচ খান এবং হিন্দুস্থানী দলের সদস্য ছিলেন সঈদ ভ্রাতৃত্বয়—খান-ই-দুরান এবং হিন্দু নেতারা পারিবারিক সম্পর্ক, ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব এবং স্বার্থবোধ থেকে দলগুলি গড়ে উঠেছিল। ইরানি নেতা জুলফিকার খানের সমর্থক ছিলেন আফগান নেতা দাউদ-খান-পান্নি এবং হিন্দু নেতা রাও রামসিংহ ও দলপত রাও বুন্দেলা। ফারুকশিয়ারের সময় সঈদ ভ্রাতৃদ্বয় ক্ষমতায় এলে তারা তুরানি নেতাদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। ১৭২৪ সালে নিজাম-উল-মুলুক নিজের স্বার্থরক্ষার জন্যে মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

কিন্তু অভিজাতশ্রেণীর দলাদলি কখনই অহিংস সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নেয়নি। তারা রাজসভায় সর্বদা ক্ষমতা দখলের জন্য ষড়যন্ত্র করছিলেন। এই অবস্থায় উজীররা যদি সম্রাটের অকুণ্ঠ সমর্থন পেতেন তাহলে হয়তো তারা সাম্রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য কিছু গঠনমূলক নীতি গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দুর্বলচেতা সংকীর্ণমনা স্রাটরা নিজেদের সিংহাসন বঁচানোর জন্য দলাদলি বন্ধ করবার পরিবর্তে তার ভারসাম্যকে বজায় রেখে নিজেরা টিকে থাকার চেষ্টা করতেন। যোগ্য সম্রাট ও উজীরের অভাবে সাম্রাজ্য দুর্বল হ'ল ; প্রায় খণ্ডিত হবার আশঙ্কা দেখা দিল। অনেকে সম্রাটের নিকট নামমাত্র আনুগত্যের পরিবর্তে স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। শুরু হ'ল দলত্যাগ ও বিভাজন। অষ্টাদশ শতকে মুঘল শাসকবর্গ নতুন নীতি অনুসরণ করে সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালী করে তোলার পরিবর্তে নিজেরাই তার অবলপ্তির প্রধান সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

৩৪.৫ সারাংশ

মুঘল রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে অভিজাতবর্গের গুরুত্ব অনুধাবন করতে না পারলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের প্রক্রিয়াকে যথাযথভাবে উবলব্ধি করা যাবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক সঙ্কটের পিছনে অভিজাতবর্গের দুর্বল রাজনৈতিক ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

মুঘল সমাজব্যবস্থা চূড়ান্ত অসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অভিজাতশ্রেণী ও জমিদারদের নিয়ে মুঘল শাসকশ্রেণী গঠিত ছিল। এদের মধ্যে অনেক বিদেশীদের দেখতে পাওয়া যায় যদিও পরবর্তীকালে

তারা ভারতীয় ভাবধারা আয়ত্ত করেছিলেন। এরা ছিলেন সুবিধাভোগী শ্রেণী। অপরদিকে সুযোগ-সুবিধাহীন অসংখ্য কৃষককুল এবং জনতার অন্যান্য অংশ নিয়ে শাসিত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। এদের উভয়ের মাঝে সংখ্যালঘু ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল বণিক শ্রেণীর অবস্থান ছিল।

ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারতে জমিদারী প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল। তুর্ক-আফগান শাসকদের সময় থেকেই জমিদারদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সেই চেষ্টা ছিল সাময়িক, ফলে জমিদাররো আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও কলহের মধ্য দিয়ে টিকে থাকেন। জায়গীরদারেরা ভূস্বামী হ'লেও তারা ছিলেন মুঘল বাদশাহের কর্মচারী। রাষ্ট্রকে সেবা করবার পরিবর্তে তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি ভোগ করতেন ; জমির উপর তাদের অধিকার ছিল সীমিত, ফলে অধিকাংশ সময়েই তারা জমির উন্নতিতে আগ্রহ দেখাতেন না। বণিককুল তাদের অস্তিত্বের জন্যে সম্রাট ও জায়গীরদারের উপর নির্ভর করতেন। প্রায়শ তাদের কোন স্বাধীন ভূমিকা ছিল না, জমিদার ও জায়গীরদারের তলায় পুরুষানুক্রমে অধিকারভোগী কয়েক শ্রেণীর ক্ষুদ্র ভূস্বামী সম্প্রদায়. লক্ষ্য করা যায়।

জায়গীরের মালিককে মনসবদার বলা হ'ত। এরা ছিলেন মুঘল সামরিক সংগঠনের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। "সওয়ার" ও "জাত" অনুযায়ী মনসবদারদের নানা ভাগে ভাগ করা যায়। সরকার বা রাষ্ট্রের প্রতি নয়, নিয়োগকর্তা হিসাবে জায়গীরদারদের সমস্ত আনুগত্য ছিল সম্রাটের প্রতি। শক্তিশালী সম্রাটের আমলে স্থিতাবস্থা দেখা যায় কিন্তু ঔরঙ্গজেবের পরে দুর্বল সম্রাটদের সময় সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়ে। ঔরঙ্গজেবের পরবর্তীকালে মুঘল সামরিক বাহিনীকে বোঝবার জন্যে সমসাময়িক অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলিকে অনুশীলন করা দরকার। মনসবদারদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়তে থাকে এবং অতিরিক্ত সম্পদ উৎপাদন করা প্রচলিত কৃষিব্যবস্থার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

কৃষি ও কৃষকের উপর অত্যধিক চাপ পড়ায় মুঘল রাজত্বের শেষের দিকে ব্যাপক কৃষি-বিদ্রোহ দেখা যায়। হিন্দু জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ মুঘল সরকারের সামনে জটিল সমস্যার উপস্থিত করে ; বিশেষ করে মারাঠা বিদ্রোহকে দমন করার ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় সুনিশ্চিত হয়। এই অবস্থায় দেখা যায় "জা ?গীরদারি সঙ্কট"। সমস্ত মনসবদারেরা উপযুক্ত পরিমাণে জায়গীর পচ্ছিলেন না। আবার যারা জায়গীর পেয়েছিলেন তারা সেখান থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারছিলেন না। ঔরঙ্দজেব বিজাপুর ও াগলকুণ্ডা রাজ্য জয় করে জায়গীরদারি সমস্যার সমাধার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার ভ্রান্ত নীতির জন্যে প্রার্থিত ফল লাভ করা যায়নি।

জায়গীরদারি সঙ্কট থেকে উদ্ভূত হয় মুঘল দরবারে "দল" ও রাজনীতি। তিনটি উপদলে বিভক্ত মুঘল অভিজাতরা সর্বদা আত্মকলহে মত্ত থেকে সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে। পক্ষান্তরে দুর্বল রাষ্ট্রব্যবস্থা তাদের সংরক্ষণ করতে পারে না। পরিণামে তাদেরও অবসান ঘটে।

৩৪.৬ অনুশীলনী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। মুঘল সাম্রাজ্যের স্তরবিন্যাসে জমিদারদের অবস্থান আলোচনা করুন।

২। মুঘল-মারাঠা সম্পর্কের উপর সমালোচনামূলক নিবন্ধ পেশ করুন।

৩। জায়গীরদারি ব্যবস্থার সঙ্কট কিভাবে সৃষ্টি হ'ল এবং এর কোন স্থায়ী সমাধান পাওয়া গেল না কেন ?

৪। সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

(ক) মুঘল অভিজাতদের বিভিন্ন দল বিভাজন বর্ণনা করুন।

(খ) মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থায় বণিক সমাজের দুর্বল ভূমিকার কারণ কি ?

(গ) ঔরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি কতটা ভ্রান্ত ছিল ?

৩৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. Habib, Irfan : *The Agrarian System of Mughal India.*
2. Chandra Satis : *Parcty Politics in the Mughal Court.*
3. Habib, Irfan (ed) : *The Mediavel India, Vol-1.*
4. Raychaudhury Tapan & Habib, Irfan (ed) : *The Cambridge History of India,* Vol.1.
5. বন্দ্যোপাধ্যায় শেখর : *অষ্টাদশ শতকের মুঘল সঙ্কট ও আধুনিক ইতিহাস চিন্তা।*